পেলে মিথের মৃত্যু নেই

উপল বড়ুয়া

২৩ অক্টোবর ১৯৪০-২৯ ডিসেম্বর ২০২২

‘নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়’– পরক্ষণে ফের কবি জীবনানন্দ দাশের সংশয়পূর্ণ চোখে জানতে চাওয়া, ‘হয় নাকি?’ জীবনানন্দের এই প্রশ্ন যে অমূলক নয়, সেটিই যেন বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন ফুটবলের রাজা পেলে। ‘কিংবদন্তির মৃত্যু নেই’– এই প্রবাদবাক্য কে না জানে! পেলেও যে তেমন অমর কিংবদন্তি! কথায় আছে, দৈহিক মৃত্যুর আগে মানসিক মৃত্যু ঘটে। তবে কিছু মৃত্যু শুধু দৈহিক। যে মানুষটি দুই দশকেরও বেশি সময় ফুটবল পায়ে বিনোদিত করেছেন, কোটি মানুষকে জুগিয়েছেন বেঁচে থাকার রসদ, তিনি যে অমর!

পেলের দৈহিক মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ফুটবলপ্রেমীদের কাছে তিনি অমর, অক্ষয়। আজীবন ভাস্বর হয়ে থাকবেন সবার হৃদয়ে। ফুটবল আর পেলে সমার্থক হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। বলতে গেলে, এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তোর মৃত্যু হয়েছে, পেলের নয়। পেলে এমন এক মিথ, যার মৃত্যু নেই। কেননা মানুষ বাঁচে মিথের ভেতর।

১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর ব্রাজিলের এক বস্তিতে জন্ম নাসিমেন্তোর। সেই বস্তির বন্ধুদের সঙ্গে সকাল-সন্ধ্যা ফুটবল খেলে কেটেছে শৈশব। কখনো মাঠে তো কখনো বস্তির অলিতে-গলিতে। ছোটবেলায় আমরা যেমন গ্রামের এখানে ওখানে ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নিতাম তেমনই কেটেছে পেলের জীবনেও। খুব অল্প বয়সেই দেখেছেন জীবনের নিষ্ঠুরতা। দারিদ্র্যের সঙ্গে বন্ধুর মৃত্যুও দেখতে হয়েছে চোখের সামনে। সেই বস্তি থেকে উঠে এসে পুরোনো নাম ঝেড়ে আজকের সবার কাছে একনামে পরিচিত পেলে হয়ে ওঠা এবং বিশ্ব ফুটবলের সম্রাটের সিংহাসনে বসা মোটেও সহজ ছিল না তার জন্য। দারিদ্র্য ও প্রতিপক্ষ যেখানে দমিয়ে রাখতে পারেনি সেখানে আজীবনের এক যোদ্ধাকে হারাতে কী বেগই না পেতে হয়েছে যমদূতকে পর্যন্ত! বয়স ৮০ পেরিয়ে যাওয়ায় অসুস্থতা জেঁকে বসেছিল শরীরে। বাসা বেঁধেছিল মরণব্যাধি ক্যানসার। ভালোভাবে বসতেও পারতেন না। সঙ্গী হয়েছিল বিছানা। কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও মুখ থেকে হাসি উবে যায়নি পেলের ঠোঁট থেকে। মৃত্যু কাছে এলে কখনো ডজ দিয়ে তো কখনো ড্রিবল করে বেরিয়ে গেছেন বারবার। মৃত্যুকেও বোকা বানানো অত সহজ কী! গত নভেম্বরের শেষ দিকে রুটিন চেক-আপ করতে গিয়ে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পেলে। কিন্তু এবার আর ঘরে ফেরা হয়নি মহারাজার। সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে গত ২৯ ডিসেম্বর দিব্যরথে চড়ে অমর্ত্যলোকে পাড়ি জমালেন ফুটবল জাদুকর। যাওয়ার আগে মহিমান্বিত করে গেলেন মৃত্যুকেও।

বছরের শেষটায় পেলে কাঁদিয়ে গেলেন সবাইকে। নভেম্বর আর ডিসেম্বর চিরদিন শোকের মাস হয়ে থাকবে ফুটবল ভক্তদের মনে। ফুটবল কেবল খেলায় নয়, কিছু কিছু মানুষের কাছে ধর্মের সমান। সেই ফুটবলকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়ে ঈশ্বর দু’জন দেবদূততে পাঠিয়েছিলেন বসুধায়। তার একজন আগেই তো ফিরে গেছেন ঈশ্বরের কাছে। দুই বছর আগে ২৫ নভেম্বর আকস্মিক ভাবে ডিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুর খবর শুনে স্তব্ধ হয়ে হয়ে যায় পৃথিবী। ৬০ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন ছিয়াশির মহানায়ক। ফুটবল ঈশ্বর ও বন্ধুর মৃত্যুতে পেলে নিজের টুইটারে লিখেছিলেন, ‘আশা করি, একদিন স্বর্গে একত্রে ফুটবল খেলব।’ বন্ধুকে ছেড়ে যেন আর থাকতে পারলেন না ফুটবলের রাজা। বল নিয়ে ফের মেতে উঠতে মধ্যরাতে ৮২ বছর বয়সে পাড়ি দিলেন দিব্যলোকে। স্বর্গে বসে পেলে ও ম্যারাডোনা কী করছেন নিশ্চয় বলে দিতে হবে না!

মহাকবি দান্তের ‘ডিভাইন কমেডি’ নিশ্চয় পড়েছেন! স্বর্গভ্রমণে দান্তে সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন আরেক ইতালিয়ান মহাকবি ভার্জিলকে। যিনি দান্তেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নরক ও নরকের বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরে নিয়ে যান স্বর্গে। পেলেকে স্বর্গে স্বাগত জানিয়ে ম্যারাডোনাও হয়তো সেখানে নতুন অথিতিকে

পরিচয় করিয়ে দেবেন সবার সঙ্গে। অবসরে হয়তো পেলে গিটার হাতে ম্যারাডোনাকে শোনাবেন তাকে নিয়ে রচিত গানটি। কিংবা দেবরাজ ইন্দ্র, দেবতা জিউস, হারকিউলিস, থরদের সঙ্গে এক প্রীতি ম্যাচেরও আয়োজন করে বসতে পারেন দুজনে। ম্যারাডোনার যা একটু পাগলেটে স্বভাব, এমনটা হলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। আর নিজেদের দল সাজাবেন স্বর্গীয় সব কিংবদন্তি ফুটবলারদের নিয়ে। যে দলে থাকবেন আলফ্রেদো দি স্তেফানো, পেলে, ইয়োহান ক্রুইফ, জার্ড মুলার, পাওলো রসি, ম্যারাডোনা...। মর্ত্যের জন্য এমন এক কিংবদন্তিতুল্য ফুটবল একাদশের কথা ভাবুন তো! মানুষ যেহেতু কল্পনাবিলাসী প্রাণী; এমনটা ভাবতে দোষ কী! মূলত কল্পনা থেকেই তো আজকের দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি।

ফুটবলের অসংখ্য রূপকথার জন্ম হয়েছে পেলের পায়ে। বল পায়ে তিনি হয়ে উঠতেন নিখুঁত শিল্পী। আর মাঠকে বানাতেন এক সবুজ ক্যানভাস। বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর পাবলো পিকাসোর মতো রঙ ছড়িয়ে মূর্ত করে তুলতেন একেকটি কিউবিক ফিগার। পেলের একেকটি ডজ, ড্রিবল, কিক, জাগলিং দেখার জন্য দর্শকদের মাঝে মাঠে শুরু হতো হুল্লোড়। শুধু তার খেলা দেখতে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গৃহযুদ্ধ। যা কল্পনাকেও হার মানায়। কনমেবল অঞ্চলে একের পর এক জয়ে ক্লান্ত পেলে ১৯৬৯ সালে ব্রাজিলের ক্লাব সান্তোসের হয়ে আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি নাইজেরিয়ার লাগোসে পা রাখার পর দেশটির গৃহযুদ্ধ থেমে গিয়েছিল তিন দিনের জন্য।

ফুটবল ইতিহাসে অসংখ্য ঘটনার প্রথম জন্ম হয়েছিল পেলের পায়ে। রেকর্ড তিনটি বিশ্বকাপ জয়, ১৭ বছর বয়সে বিশ্বকাপে অভিষেকের পর সবচেয়ে কম বয়সে গোল, হ্যাটট্রিক আর ফাইনালে সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতার সেসব রেকর্ড এখনো টিকে আছে। ভবিষ্যতেও ভাঙার সম্ভাবনা ক্ষীণ। পেলেকে পরিমাপের জন্য অনেক পরিসংখ্যান-হিসাব হয়তো দেওয়া যায়। কিন্তু তার আগে ফুটবলে শৈল্পিক তুলির আঁচড় আর দেখা যায়নি। মানুষ ফুটবলকে চিনেছে ফুটবল ভালোবাসতে শিখেছে পেলের খেলা দেখে।

১৯৬৫ সালে বেলজিয়ামের বিপক্ষে আকাশে ভেসে ওভারহেড কিক, ১৯৭০ বিশ্বকাপে উরুগুয়ের বিপক্ষে জাদুকরী ড্রিবলিং, একই বিশ্বকাপে তৎকালীন চেকোস্লোভাকিয়ার বিপক্ষে মাঝমাঠ থেকে লম্বা শট কিংবা সুইডেনের বিপক্ষে ১৯৫৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে বল রিসিভের পর চিপ করে ডিফেন্ডারের মাথার ওপর দিয়ে গোল– দীর্ঘ ২১ বছরের ক্যারিয়ারে কী করে দেখাননি পেলে! পেশাদার ফুটবলে এত বছর খেলে যাওয়া কী কম কথা!

প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের সাক্ষাৎ যমদূত পেলে একের পর এক চোট পেয়েছেন, তবু থামেননি। ডিফেন্ডারদের আঘাত থেকে বাঁচাতে শেষ পর্যন্ত অনন্য এক উদ্যোগ গ্রহণ করে তখনকার ব্রাজিল

সরকার। মহাবন আমাজনের মতো পেলেকেও ‘জাতীয় সম্পদ’ ঘোষণা করা হয়।

এখন তো ফুটবল হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপীয় অর্থের ঝনঝনানি। চোখ কপালে তুলে দেওয়ার মতো একেকটি ট্রান্সফারের রেকর্ড। পেলের সময়েও যে এসব ছিল না তা নয়। তবে ইউরোপের অঢেল অর্থের হাতছানি উপেক্ষা করে ১৮ বছর ধরে সান্তোসের হয়ে খেলে গেছেন তিনি। ক্লাবটির তখন লাতিন আমেরিকার তো বটে বিশ্বের অন্যতম ফুটবল পরাশক্তি হিসেবেও গড়ে ওঠে পেলের জাদুতে। হাজার ম্যাচ খেলে হাজার গোল কি চাট্টিখানি কথা! পেলেই অবিশ্বাস্য সেসব করে দেখিয়েছেন এবং সবার আগে। মানুষ ব্রাজিলের ফুটবল সৌন্দর্যকে চিনেছে পেলেকে দিয়ে। সান্তোসের মাঠে ‘জিঙ্গা’ ফুটবলের ধ্বনিকে প্রাণ দিয়েছেন তিনিই।

ছোটবেলায় একটা কথা শুনতাম। পেলে আজকের পেলে হয়ে উঠেছেন ‘জাম্বুরা’কে ফুটবল বানিয়ে খেলে। অবিশ্বাস্য লাগলেও কথাটা অসত্য নয়। ‘পেলে’ নামের চলচ্চিত্রটি দেখলে সত্যটা পেয়ে যাবেন। পঞ্চাশের দশকে তো এখানকার মতো এতো সুযোগ সুবিধা ছিল না। চাইলেই হাতের নাগালে ফুটবল-বুট এসব তো অকল্পনীয়। সেটিও ব্রাজিলের মতো এক অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর দেশে। কেবল পেলে নয়; রোনালদিনহোর মতো ব্রাজিলের অনেক ফুটবলার সেসব প্রতিকূলতা দূর করে ‘ফাভেলা’ থেকে হয়ে উঠেছেন কিংবদন্তুল্য। তারা ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে পেলেকে দেখে। পেলেই বুঝিয়ে দিয়েছেন, ফুটবল পায়ে ভাগ্যকেও পাল্টে দেওয়া সম্ভব। কালো কালো মানুষদের বাঁচতে শিখিয়েছেন তিনি। লাতিন আমেরিকা থেকে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের শত বাধার মুখেও ফুটবলের প্রেমাসক্ত হয়েছেন পেলেকে দেখে।

ইউরোপের যান্ত্রিক ফুটবলের বিপরীতে পেলের শৈল্পিক ফুটবলকে ভালোবেসেছিল মানুষ। কেউ যদি বলেন, ব্যক্তিজীবনে পেলে রাজনীতিতে সরব ছিলেন না বা পক্ষ নিয়েছিলেন একনায়কতন্ত্রের, তাহলে উপরের কথাগুলোও তার জন্য। ব্যক্তি পেলের দর্শন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু ফুটবলার পেলে অদ্বিতীয়। লাতিন ফুটবলের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দেওয়া, অবহেলিত কালোদের স্বপ্ন দেখানো, ইউরোপের অর্থ উপেক্ষা করে ক্যারিয়ারের পুরোটা সময় এক ক্লাবে কাটিয়ে দিয়ে বিশ্বাস্যযোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া; এসব কী রাজনীতির ঊর্ধ্বে?

১৯৫০ বিশ্বকাপে ঘরের মাঠ মারাকানায় ব্রাজিল শিরোপা জিততে না পারায় কেঁদেছিলেন পেলের বাবা দোনদিনহো। যিনি নিজেই ছিলেন একজন ফুটবলার। বাবার দুঃখ দেখে পেলে নামের ৯ বছর বয়সী এক ছেলে বলেছিল, ‘আমি ব্রজিল ও তোমাকে বিশ্বকাপ এনে দেব’। লাজুক ও অন্তর্মুখী এক বিস্ময়বালক থেকে সৌন্দর্যের রূপক হয়ে ওঠা প্রজাপতির মতো পেলে তার কথা রেখেছিলেন পরের ৮ বছরের মধ্যেই।

কাতার বিশ্বকাপ চলাকালীন গুঞ্জন উঠেছিল, পেলে মারা গেছেন। সেই গুঞ্জন সত্যি হলো, বিগত বছরের শেষ সময়ে। ফুটবল সম্রাটের বিদায়ের শোক এখনো ঘিরে আছে সবাইকে। তার বিদায়ে কেঁদেছে ফুটবল, পুরো বিশ্ব। ব্রাজিল সরকারের ঘোষিত তিন দিনের শোক সে তুলনায় ছিল কিছুই নয়। যেখানে পেলে হয়ে ওঠা সেই সান্তোসে তাকে বিদায় জানিয়েছে সবাই। ম্যারাডোনাকে ছাড়া কাতার বিশ্বকাপ হয়েছে। ভাবা যায়, ২০২৬ বিশ্বকাপে থাকবেন না ফুটবলের দুই দেবদূত পেলে ও ম্যারাডোনা! ফুটবল যেন দুই অভিভাবককে হারিয়ে অনাথ হয়ে গেছে আবার।